একক ৪৩ ☐ স্বামী বিবেকানন্দ ঃ শূদ্র জাগরণ

গঠন

৪৩.১ উদ্দেশ্য
৪৩.২ প্রস্তাবনা
৪৩.৩ স্বামী বিবেকানন্দ ঃ জীবনকথা
৪৩.৪ স্বামী বিবেকানন্দ ঃ তাঁর প্রবন্ধ সাহিত্য
৪৩.৫ মূলপাঠ - ১
৪৩.৬ প্রাসঙ্গিক আলোচনা ও বিশ্লেষণ
৪৩.৭ সারাংশ - ১
৪৩.৮ অনুশীলনী - ১
৪৩.৯ মূলাপাঠ - ২
৪৩.১০ প্রাসঙ্গিক আলোচনা ও বিশ্লেষণ
৪৩.১১ সারাংশ - ২
৪৩.১২ অনুশীলনী - ২
৪৩.১১ গ্রন্থপঞ্জি

৪৩.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে আপনি স্বামী বিবেকানন্দের—

- গদ্য রচনার বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করতে পারবেন ;
- তৎকালীন বিশ্বের ও ভারতবর্ষের শূদ্রজাতির অবস্থা সম্পর্কে অবহিত হতে পারবেন।

৪৩.২ প্রস্তাবনা

বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ কেবল ধর্মতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করেননি ; তিনি ছিলেন—কর্মবীর। কর্মের মধ্য দিয়েই তিনি জগৎকে দেখেছিলেন। সেই কর্মের দিক থেকে জগৎকে দেখবার ফলে ইতিহাস, রাজনীতি এবং স্বদেশপ্রেমকে তিনি বিশেষ মূল্য ও গুরুত্ব দিয়েছেন। ঊনবিংশ শতকের সব বাঙালি মনীষীই তাদের স্বদেশ প্রেমের ক্ষেত্রে ইতিহাস এবং রাজনীতিকে বিশেষভাবে ভিত্তি করেছেন এবং দেশে-দেশে ঐতিহাসিক রাজনৈতিক ঘটনাবলির যে বিচিত্র প্রতিক্রিয়া দেখা যায়, তার তুলনামূলক আলোচনা করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথেরও স্বদেশপ্রেম ইতিহাস ও রাজনীতির পটভূমিকায় আলোচিত হয়েছে। স্বামী বিবেকানন্দও সেই পথে চারণা করেছেন, তবে তা একান্তভাবে তাঁরই অনুগত পথে। আলোচ্য 'শূদ্র জাগরণ' (এটি তাঁর 'বর্তমান ভারত' গ্রন্থ থেকে গৃহীত) প্রবন্ধটিতেও তিনি ভারতবর্ষের শূদ্র জনগণের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থানটি গভীরভাবে ভেবে দেখেছেন। শূদ্র বলতে তিনি কেবল ভারতীয় একটি বিশিষ্ট বর্ণকেই বোঝাননি, বিশ্বের যেখানেই যত অনুন্নত, পীড়িত মানুষ আছে, তাদেরও বুঝিয়েছেন। এখানেই তিনি মানবতাবাদী, এখানেই তাঁর দৃষ্টি কেবল ভারতবর্ষের মধ্যেই আবদ্ধ না থেকে সমগ্র বিশ্বে প্রসারিত হয়েছে। শেষপর্যন্ত ভারতীয় শুদ্রকে তিনি ইংরেজের শাসনাধীন যে কোনো ভারতীয়কেই

বুঝিয়েছেন। এইভাবে তিনি প্রবন্ধটির ভাব ও অর্থগত সীমাকে বাড়িয়ে দিয়েছেন। বিচিত্র অর্থে 'শূদ্র' বর্ণটিকে গ্রহণ করে তাদের সর্বপ্রকার সমস্যার উৎস যেমন নিরূপণ করেছেন তেমনি সেই সমস্যার পথও নির্দেশ করেছেন তিনি। এই প্রসঙ্গে আরো উল্লেখযোগ্য কথা হল,—ইংরেজের প্রসঙ্গের উত্থাপন। বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, সকলেই স্বাভাবিক কারণেই ভারীতয় জীবনের সমস্যার ক্ষেত্রে ইংরেজের শাসনব্যবস্থা, ইংরেজের মনোভাব নিয়ে আলোচনা করেছেন। আলোচ্য প্রবন্ধটিতেও ভারতবর্ষ সম্পর্কে ইংরেজের মনোভাব নিয়ে আলোচনা করেছেন লেখক। সব ভারতীয় আলোচকই ভারতীয় জীবনের সর্বপ্রকার সমস্যাকে দু'দিক থেকে লক্ষ করেছেন ; একদিক হল ভারতবাসীর নিজের কর্তব্য, অপরদিক হল শাসকরূপে ইংরেজের কর্তব্য। এই দুই দিকের কর্তব্য যখন একসঙ্গে মিলবে, তখনই শূদ্রদের জাগরণ সম্ভব ও সার্থক হবে। সমগ্র বিশ্বের সমাজতত্ত্ব, রাজনীতি ও ইতিহাস সম্পর্কে বিবেকানন্দের যে বিস্তৃত পড়াশোনা ছিল, এই প্রবন্ধটি থেকে তা প্রমাণিত হয়। তাঁর আন্তরিকতার সঙ্গে তাঁর মনীষার শুভ সংযোগের পলে এটি একটি বিখ্যাত প্রবন্ধরূপে পরিচিত লাভ করে।

৪৩.৩ স্বামী বিবেকানন্দের জীবনকথা

ঊনবিংশ শতাব্দীর যে ক'জন কর্মবীর ভারতবর্ষের সর্বপ্রকার উন্নতিবিধানকল্পে আত্মনিয়োগ করেন, স্বামী বিবেকানন্দ (নরেন্দ্রনাথ দত্ত ঃ জন্ম ঃ ১২.১.১৮৬৩। প্রয়াণ ঃ ৪.৭.১৯০২) তাঁদের মধ্যে একজন অগ্রগণ্য পুরুষ। রোমাঁ রোল্যাঁ, ভগিনী নিবেদিতা, সহোদর ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত এবং অসংখ্য লেখক-লেখিকা তাঁর জীবন ও কর্মসাধনা নিয়ে তথ্যবহুল , বিশ্লেষণীধর্মী আলোচনা করেছেন। রবীন্দ্রনাথ-বিবেকানন্দ পরস্পরের সম্বন্ধে তেমন আলোচনা করেনি। রবীন্দ্রনাথ স্বল্পকথায় তাঁর কর্মসাধনার মূল্যায়ন করেছেন ঃ "স্বামী বিবেকানন্দ ভারতের ও পশ্চিমের সাধনাকে দক্ষিণে ও বামদিকে রাখিয়া তাহার মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়াছিলেন। ভারতবর্ষের ইতিহাসের মধ্যে পাশ্চাত্যকে অস্বীকার করিয়া তাহাকে চিরদিন সংকীর্ণতার মধ্যে সংকুচিত করিয়া রাখা তাঁহার জীবনের উপদেশ নহে। তিনি ভারতবর্ষ ও পাশ্চাত্যের মিলন সেতু রচনার জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। গ্রহণ করিবার, মিলন করিবার ও সৃজন করিবার প্রতিভাই তাঁহার ছিল।"

বিবেকানন্দ জেনারেল এসেম্বলি কলেজের (পরে যার নাম হল—স্কটিশচার্চ কলেজ) স্নাতক। ছাত্রাবস্থাতেই দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে তাঁর প্রতিভার স্ফুরণ ঘটে। বিজ্ঞানের মধ্যে রসায়ন ও পদার্থবিদ্যার প্রতি তাঁর বিশেষ আকর্ষণ ছিল। সমকালীন পাশ্চাত্য দার্শনিকেরা স্বভাবতই তাঁকে আকৃষ্ট করেছিলেন। তিনি ছিলেন তর্কনিপুণ, বুদ্ধি ও যুক্তি দিয়ে বক্তব্যকে বিন্যস্ত করতেন। তাঁর মধ্যে ছিল নেতৃত্ব করবার শক্তি ও ব্যক্তিত্ব। সংগীত বিষয়ে তাঁর ছিল বিশেষ আগ্রহ, নিজে সংগীতও রচনা করেছিলেন। তাঁর রচিত যে গানটি শুনে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ মুগ্ধ হয়েছিলেন, তাঁর প্রথম দুই পঙ্‌ক্তি ঃ 'নাহি সূর্য নাহি জ্যোতিঃ নাহি শশাঙ্ক সুন্দর,/ভাবো ব্যোমে ছায়াসম, ছবি বিশ্ব-চরাচর'। আসলে তাঁদের বাড়িতেই ছিল সংগীত-চর্চার ধারা। এই সংগীত-প্রিয়তা ও সংগীত প্রতিভা তাঁর মানসকে এক বিশেষ স্তরে উন্নীত করে। তাঁর জীবনের এক বিশেষ ঘটনা আমেরিকার শিকাগো শহরে বিশ্বধর্মসম্মেলনে যোগদান এবং সেখানে তাঁর পরিচিত। ১১ই সেপ্টেম্বর, ১৮৯৩, এই মহাধর্ম সম্মেলন শুরু হয়, ১৭ দিন ধরে তা চলে। তিনি চার বছর ধরে (১৮৯৪—১৮৯৭) আমেরিকা ও ইংলন্ড পরিভ্রমণ করেন। বহু ব্যক্তির সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ঘটে, বহু মানুষ তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। ভারতবর্ষকে জানবার জন্য তিনি ভারত ভ্রমণ করেন, তারই অভিজ্ঞতা 'পরিব্রাজক' নামে তাঁর গ্রন্থে বিবৃত হয়েছে।

শিক্ষা সম্বন্ধেও তিনি ভাবনা-চিন্তা করেছেন। তাঁর ধর্ম মানুষ তৈরির ধর্ম। তিনি বলতেন ঃ "যাহাতে মানুষ প্রস্তুত হয়, এমন সর্বাঙ্গ-সম্পন্ন শিক্ষার প্রয়োজন—" একটি চিঠিতে তিনি বলেছেন, স্বদেশি বিদ্যার সঙ্গে ইংরেজি এবং বিজ্ঞান পড়াতে হবে। দিতে হবে টেকনিক্যাল এডুকেশন, দেশে যাতে ইন্ডাস্ট্রি বাড়ে। তাঁর এ চিন্তা ও যুগের পক্ষেও প্রাসঙ্গিক। তিনি আরো বলেছেন ঃ "জনশিক্ষা বিস্তারই জাতীয় উন্নতির মূল।"

তাঁর জীবনের লক্ষ্য ছিল—প্রাচীন ভারতের আদর্শকে উজ্জীবিত করা, তাঁর জীবনের ভিত্তি হল—অদ্বৈত বেদান্তবাদ। তাঁর সাধনা—ত্যাগ ও সেবার সাধনা, নানাপ্রকার অস্পৃশ্যতাকে পরিহার করা। জীবনই তাঁর কাছে শিব। "জীবে প্রেম করে যেই জন, সেইজন সেবিছে ঈশ্বর।" ভারতবর্ষের দরিদ্রজনের অস্পৃশ্যজনের হীনজনের প্রতীক ও প্রতিনিধি তিনি। দেশের যুবশক্তির প্রতি ছিল তাঁর অগাধ আস্থা, সর্বপ্রকার কর্মে তিনি তাদেরই আহ্বান করেছেন। তিনি নিজেই বলতেন ঃ "আবার ভারতকে জগৎ জয় করিতে হইবে। ইহাই আমার জীবন-স্বপ্ন।" নারীজাতির প্রতি তাঁর ছিল বিশেষ শ্রদ্ধা। 'হিন্দুনারীর আদর্শ' নামে একটি সংক্ষিপ্ত রচনাও তিনি লিখেছিলেন।

শ্রী অরবন্দি এই জন্যেই তাঁকে "এক শক্তিধর পুরুষ' বলে বর্ণনা করেছিলেন।

৪৩.৪ স্বামী বিবেকানন্দ ঃ তাঁর প্রবন্ধ সাহিত্য

অকাল মৃত্যুর কারণে বিবেকানন্দের অনেক রচনাই তাঁর মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয়। ইংরেজি এবং বাংলা—দুই ভাষাতেই তিনি প্রবন্ধাদি রচনা করেছেন ; ইংরেজি—বাংলাতে আছে তাঁর পত্রাবলী। যাকে বলে 'পত্র-প্রবন্ধ' এগুলির মধ্যে অনেকগুলিই সেই ধারার। পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথের হাতে পত্র-প্রবন্ধ বিশেষ পরিচিতি লাভ করে, যদিও প্রথম বয়স থেকেই রবীন্দ্রনাথও ভ্রমণ-পত্র ইত্যাদি লিখে এসেছেন।

বাংলা ভাষায় বিবেকানন্দের প্রবন্ধের ও পত্রের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল—কথ্য বাংলাকে গুরুত্ব দেওয়া। তাঁর সাধু ভাষায় লেখা গদ্য যেমন সহজ-সাবলীল, কথ্য ভাষায় লিখিত গদ্য তেমনি স্বাভাবিক ও হৃদয়গ্রাহী। যে সময়ে অন্যান্য গদ্য শিল্পীরা সাধু বাংলায় রচনাদি লিখছেন, সেই সময় কথ্য গদ্যকে এসব স্বীকৃতি দান বিশেষ দূরদৃষ্টির পরিচায়ক। পরবর্তীকালে বাংলা ভাষায় কথ্য গদ্যই ব্যবহৃত হতে থাকে।

বিবেকানন্দের কর্ম ও সাধনার দিকটি তাঁর প্রবন্ধে ও পত্রে সম্যক রূপে প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর অধিকাংশ প্রবন্ধ প্রথম প্রকাশিত হয়—'উদ্বোধন' এবং 'প্রবুদ্ধ ভারত' নামে দুটি সামায়িক পত্রে। প্রবন্ধগ্রন্থগুলি হল ঃ 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' (১৯০২), 'বর্তমান ভারত' (১৯০৫), 'পরিব্রাজক' (১৯০৫), 'ভাববার কথা' (বিভিন্ন বিষয়ের রচনার সংকলন, (১৯০৭), এছাড়া পত্র-সংকলন 'পত্রাবলী'। 'ভাববার কথা' বইতে তিনি কথ্য বাংলা ভাষা সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন ঃ

"...স্বাভাবিক যে ভাষায় মনের ভাব আমরা প্রকাশ করি, যে ভাষায় ক্রোধ, দুঃখ, ভালবাসা ইত্যাদি জানাই—তার চেয়ে উপযুক্ত ভাষা হ'তে পারেই না ; সেই ভাব, সেই ভঙ্গি, সেই সমস্ত ব্যবহার ক'রে যেতে হবে। ও ভাষায় যেমন জোর, যেমন অল্পের মধ্যে অনেক, যেমন যেদিকে ফেরাও সেদিকে ফেলে, তেমন কোন তৈয়ারী ভাষা কোনওকালে হবে না। ভাষাকে করতে হবে—যেন সাফ ইস্পাৎ মুচ্‌ড়ে মুচ্‌ড়ে যা ইচ্ছে কর—আবার যে-কে সেই, এক চোটে পাথর কেটে দেয়, দাঁত পড়ে না।"

ধর্মচিন্তা, রাজনৈতিক ও স্বাদেশিকতার চিন্তা, শিক্ষা ও ইতিহাস-চিন্তা তাঁর প্রবন্ধ-সাহিত্যের নানা দিক। 'রাজযোগ' গ্রন্থে ধর্মগত জটিলতত্ত্বকে বৈজ্ঞানিক যুক্তি দিয়ে ব্যাখ্যা করেছেন। নব্য ভারতকে তিনি রজোগুণ ও কর্মযোগের সম্মিলনে দীক্ষা দিতে চেয়েছেন। এ বিষয়ে তাঁর 'সংস্কারক কে ?' রচনাটি উল্লেখযোগ্য। খাঁটি সংস্কারক বলতে তিনি এই বুঝিয়েছেন ঃ

"যুদি তুমি দেশের যথার্থ কল্যাণ করিতে দাও, তবে তোমার তিনটি জিনিস থাকা চাই-ই চাই। প্রথমতঃ হৃদয়বত্তা। তোমার ভাইদের জন্য যথার্থই কি তোমার প্রাণ কাঁদিয়াছে ?... তারপর চাই কৃতকর্মতা। বল দেখি, তুমি দেশের কল্যাণের কোন নির্দিষ্ট উপায় স্থির করিয়াছ কি ?...আরও একটি জিনিসের প্রয়োজন-প্রাণপণ অধ্যবসায়।"

বিবেকানন্দের পূর্বে মূর্খ, চণ্ডাল, দরিদ্র ভারতবাসীর জন্য এমন করে কেই ভাবেননি। আলোচ্য 'শূদ্রজাগরণ' প্রবন্ধটি তারই ফল। এই মানুষদের শিক্ষা, অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়ন, অস্পৃশ্যতার কারণে দূরে ঠেলে রাখা,

তাদের সামাজিক ঊর্ধ্বায়ন—প্রভৃতিকে তিনি একদিকে আবেগ, অপরদিকে ইতিহাসের বৈজ্ঞানিক যুক্তি—দুদিক থেকেই দেখেছেন। বেদান্তধর্মকে তিনি জীবনের Practical ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে চেয়েছিলেন এভাবেই। তিনি সন্ন্যাস নিয়েছিলেন, কিন্তু সে সন্ন্যাস কর্মময় সন্ন্যাস। নিষ্কাম কর্মসাধনাই তাঁর মূল সাধনা। তাঁর গদ্যের স্টাইল হল একদিকে গাম্ভীর্য ও দৃঢ়তা (সংস্কৃতে তাঁর বিশেষ অধিকার ছিল, সংস্কৃতেও তিনি কয়েকটি কবিতাও লিখেছেন), আবার অন্যদিকে শ্লেষ-ব্যঙ্গকেও তিনি গ্রহণ করেছিলেন। অবশ্য তাঁর বাংলা ভাষায় লেখা প্রবন্ধের পরিমাণ ইংরেজির তুলনায় কম। মানুষকে একটি বিশেষ ভাবাদর্শে উদ্দীপ্ত করবার জন্যই তাঁর ভাষা এই বিশেষত্ব অর্জন করেছিল।

৪৩.৭ মূলপাঠ - ১

শূদ্র-জাগরণ

আর যাহাদের শারীরিক পরিশ্রমে ব্রাহ্মণের আধিপত্য, ক্ষত্রিয়ের ঐশ্বর্য ও বৈশ্যের ধনধান্য সম্ভব তাহারা কোথায় ? সমাজের যাহারা সর্বাঙ্গ হইয়াও সর্বদেশে 'জঘন্যপ্রভবো হি সঃ' বলিয়া অভিহিত, তাহাদের কি বৃত্তান্ত ? যাহাদের বিদ্যালাভেচ্ছারূপ গুরুতর অপরাধে ভারতে 'জিহ্বাচ্ছেদ শরীরভেদাদি' দয়াল দণ্ডসকল প্রচারিত ছিল, ভারতের সেই 'চলমান শ্মশান', ভারতেতর দেশের 'ভারবাহী পশু' সে শূদ্রজাতির কি গতি ?

এদেশের কথা কি বলিব ? শূদ্রদের কথা দূরে থাকুক ; ভারতের ব্রহ্মণ্য এক্ষণে অধ্যাপক গৌরাঙ্গো, ক্ষত্রিয়ত্ব রাজচক্রবর্তী ইংরেজে, বৈশ্যত্বও ইংরেজের অস্থিমজ্জায় ; ভারতবাসীর কেবল ভারবাহী পশুত্ব, কেবল শূদ্রত্ব। দুর্ভেদ্য তমসাবরণ এখন সকলকে সমানভাবে আচ্ছন্ন করিয়াছে। এমন চেষ্টায় তেজ নাই, উদ্যোগে সাহস নাই, মনে বল নাই, অপমানে ঘৃণা নাই, দাসত্বে অরুচি নাই, হৃদয়ে প্রীতি নাই, প্রাণে আশা নাই ; আছে প্রবল ঈর্ষা, স্বজাতিদ্বেষ, আছে দুর্বলের 'যেন তেন প্রকারেণ' সর্বনাশসাধনে একান্ত ইচ্ছা, আর বলবানের কুক্কুরবৎ পদলেহনে। এখন তৃপ্তি ঐশ্বর্য-প্রদর্শনে, ভক্তি স্বার্থসাধনে, জ্ঞান অনিত্যবস্তুসংগ্রহে, যোগ পৈশাচিক আচারে কর্ম পরের দাসত্বে, সভ্যতা বিজাতীয় অনুকরণে, বাগ্মিত্ব কটুভাষণে, ভাষার উৎকর্ষ ধনীদের অত্যদ্ভুত চাটুবাদে বা জঘন্য অশ্লীলতা বিকিরণে ; এ শূদ্রপূর্ণ দেশের শূদ্রদের কা কথা। ভারতেতর দেশের শূদ্রকুল যেন কিঞ্চিৎ বিনিদ্র হইয়াছে। কিন্তু তাহাদের বিদ্যা নাই, আর আছে শূদ্রসাধারণ স্বজাতিদ্বেষ। সংখ্যায় বহু হইলে কি হয় ? যে একতাবলে দশজনে লক্ষ জনের শক্তি সংগ্রহ করে, সে একতা শূদ্রে এখনও বহুদূর ; শূদ্রজাতিমাত্রেই এজন্য নৈসর্গিক নিময়ে পরাধীন।

কিন্তু আশা আছে। কালপ্রভাবে ব্রাহ্মণাদি বর্ণও শূদ্রের নিম্নাসনে সমানীত হইতেছে এবং শূদ্রজাতিও উচ্চস্থানে উত্তোলিত হইতেছে। শূদ্রপূর্ণ রোমকদাস ইওরোপ ক্ষত্রবীর্যে পরিপূর্ণ। মহাবল চীন আমাদের সমক্ষেই দ্রুত পদসঞ্চারে শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইতেছে, নগণ্য জাপান খধ্পতেজে শূদ্রত্ব দূরে ফেলিয়া ক্রমশঃ উচ্চবর্ণাধিকার আক্রমণ করিতেছে। আধুনিক গ্রীস ও ইতালির ক্ষত্রতাপত্তি ও তুরস্ক স্পেনাদির নিম্নাভিমুখ পতন্য এস্থলে বিবেচ্য।

তথাপি এমন সময় আসিবে, যখন শূদ্রত্বসহিত শূদ্রের প্রাধান্য হইবে, অর্থাৎ বৈশ্যত্ব ক্ষত্রিয়ত্ব লাভ করিয়া শূদ্রজাতি যে প্রকার বলবীর্য বিকাশ করিতেছে তাহা নহে, শূদ্রধর্ম কর্ম সহিত সর্বদেশের শূদ্রেরা সমাজে একাধিপত্য লাভ করিবে। তাহারই পূর্বাভাসচ্ছটা পাশ্চাত্য জগতে ধীরে ধীরে উদিত হইতেছে এবং সকলে তাহার ফলাফল ভাবিয়া ব্যাকুল। সোস্যালিজম্, এনার্কিজম, নাইহিলিজম[১] প্রভৃতি সম্প্রদায় এই বিপ্লবের অগ্রগামী ধ্বজা। যুগযুগান্তরের পেষণের ফলে শূদ্রমাত্রেই হয় কুক্কুরবৎ পদলেহক, নতুবা হিংস্রপশুবৎ নৃশংস। আবার চিরকালই তাহাদের বাসনা নিষ্ফল ; এজন্য দৃঢ়তা ও অধ্যবসায় তাহাদের একেবারেই নাই।

পাশ্চাত্য দেশে শিক্ষাবিস্তার সত্ত্বেও শূদ্রজাতির অভ্যুত্থানের একটি বিষম প্রত্যবায় আছে, সেটি গুণগত জাতি। ঐ গুণগত জাতি প্রাচীনকালে এতদ্দেশেও প্রচার থাকিয়া শূদ্রকুলকে দৃঢ়বন্ধনে বন্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। শূদ্রজাতির

১. সমাজতন্ত্রবাদ, নৈরাজ্যবাদ, নাস্তিবাদ

একে বিদ্যার্জন বা ধন সংগ্রহের সুবিধা বড়ই অল্প, তাহার উপর যদি কালে দুই-একটি অসাধারণ পুরুষ শূদ্রকুলে উৎপন্ন হন, অভিজাত সমাজ তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে উপাধিমণ্ডিত করিয়া আপনাদের মণ্ডলীতে তুলিয়া লন। তাঁহার বিদ্যার প্রভাব, তাহার ধনের ভাগ অপর জাতির উপকারে যায়, আর তাঁহার নিজের জাতি তাঁহার বিদ্যা, বুদ্ধি, ধনের ভাগ পায় না। শুধু তাহাই নহে, উপরিতন জাতির আবর্জনারাশিরূপ অকর্মণ্য মনুষ্যসকল শূদ্রবর্ণের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হয়।

বেশ্যাপুত্র বশিষ্ঠ[১] ও নারদ, দাসীপুত্র সত্যকাম জাবাল, ধীবর[২] ব্যাস, অজ্ঞাতপিতা কৃপ-দ্রোণ-কর্ণাদি সকলেই বিদ্যা বা বীরত্বের আধার বলিয়া ব্রাহ্মণত্বে বা ক্ষত্রিয়ত্বে উত্তোলিত হইল ; তাহাতে বারাঙ্গনা, দাসী, ধীবর বা সারথিকুলের কি লাভ হইল বিবেচ্য। আবার ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্যকুল হইতে পতিতেরা সততই শূদ্রকুলে সমানীত হইত।

আধুনিক ভারতে শূদ্রকুলোৎপন্ন মহাপণ্ডিতের বা কোটীশ্বরের স্বসমাজত্যাগের অধিকার নাই। কাজেই তাহাদের বিদ্যাবুদ্ধির ও ধনের প্রভাব স্বজাতিগত হইয়া স্বীয় মণ্ডলীর উন্নতিকল্পে প্রযুক্ত হইতেছে। এই প্রকার ভারতের জন্মগত জাতি, মর্যাদা অতিক্রমে অসমর্থ হইয়া বৃত্তমধ্যগত লোকসকলের ধীরে ধীরে উন্নতিবিধান করিতেছে। যতক্ষণ ভারতে, জাতিনির্বিশেষে দণ্ড পুরস্কার-সঞ্চারকারী রাজা থাকিবেন, ততক্ষণ এই প্রকার নীচ জাতির উন্নতি হইতে থাকিবে।

সমাজে নেতৃত্বে বিদ্যাবলের দ্বারাই অধিকৃত হউক, বা বাহুবলের দ্বারা, বা ধনবলের দ্বারা, সে শক্তির আধার—প্রজাপুঞ্জ। যে নেতৃসম্প্রদায় যত পরিমাণে এই শক্ত্যাধার হইতে আপনাকে বিশ্লিষ্ট করিবে, তত পরিমাণে তাহা দুর্বল। কিন্তু মায়ার এমনই বিচিত্র খেলা—যাহাদের নিকট হইতে পরোক্ষে বা প্রত্যক্ষভাবে ছল-বল-কৌশল বা প্রতিগ্রহের দ্বারা এই শক্তি পরিগৃহীত হয়। তাহারা অচিরেই নেতৃসম্প্রদায়ের গণনা হইতে বিদূরিত হয়। পৌরোহিত্যশক্তি কালক্রমে শক্ত্যাধার প্রজাপুঞ্জ হইতে আপনাকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করিয়া তৎকালীন প্রজাসহায় রাজশক্তির নিকট পরাভূত হইল ; রাজশক্তি ও আপনাকে সম্পূর্ণ স্বাধীন বিচার করিয়া প্রজাকুল ও আপনার মধ্যে দুস্তর পরিখাক খনন করিয়া অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণে সাধারণ-প্রজাসহায় বৈশ্যকুলের হস্তে নিহত বা ক্রীড়াপুত্তলিকা হইয়া গেল। এক্ষণে বৈশ্যকুল আপনার স্বার্থসিদ্ধি করিয়াছে ; অতএব প্রজার সহায়তা অনাবশ্যক জ্ঞানে আপনাদিগকে প্রজাপুঞ্জ হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন করিবার চেষ্টা করিতেছে ; এই স্থানে এ শক্তিরও মৃত্যুবীজ উপ্ত হইতেছে।

সাধারণ প্রজা সমস্ত শক্তির আধার হইয়াও পরস্পরের মধ্যে অনন্ত ব্যবধান সৃষ্টি করিয়া আপনাদের সমস্ত অধিকার হইতে বঞ্চিত রহিয়াছে, এবং যতকাল এইভাব থাকিবে ততকাল রহিবে। সাধারণ বিপদ ও ঘৃণা এবং সাধারণ প্রীতি-সহানুভূতির কারণ। মৃগয়াজীবী[৩] পশুকুল যে নিয়মাধীনে একত্রিত হয়, মনুজবংশও সেই নিয়মাধীনে একত্রিত হইয়া জাতি বা দেশবাসীতে পরিণত হয়।

একান্ত স্বজাতি-বাৎসল্য ও একান্ত ইরান-বিদ্বেষ গ্রীকজাতির, কার্থেজ বিদ্বেষ রোমের, কাফের-বিদ্বেষ আরবজাতির, মূর-বিদ্বেষ স্পেনের, স্পেন-বিদ্বেষ ফ্রান্সের, ফ্রান-বিদ্বেষ ইংলন্ড ও জার্মানির এবং ইংলন্ড-বিদ্বেষ আমেরিকার উন্নতির (প্রতিদ্বন্দ্বিতা সমাধান করিয়া) এক প্রধান কারণ নিশ্চিত।

স্বার্থই স্বার্থত্যাগের প্রধান শিক্ষক। ব্যষ্টির স্বার্থরক্ষার জন্য সমষ্টির কল্যাণের দিকে প্রথম দৃষ্টিপাত। স্বজাতির স্বার্থে নিজের স্বার্থ ; স্বজাতির কল্যাণে নিজের কল্যাণ। বহুজনের সহায়তা ভিন্ন অধিকাংশ কার্য কোনওমতে চলে না, আত্মরক্ষা পর্যন্ত অসম্ভব। এই স্বার্থরক্ষার্থ সহকারিত্ব সর্বদেশে সর্বজাতিতে বিদ্যমান। তবে স্বার্থের পরিধির তারতম্য

---

১. বশিষ্ঠের জন্মবৃত্তান্ত - ঋগ্বেদ, ৭।৩৩।১১-১৩

২. ধীবরজননীর পুত্র

৩. পশু শিকার করিয়া জীবনধারণ করে যে।

আছে। প্রজোৎপাদন ও 'যেত তেন প্রকারেণ' উদরপূর্তির অবসর পাইলেই ভারতবাসীর সম্পূর্ণ স্বার্থসিদ্ধি ; আর উচ্চবর্ণের—ইহার উপর ধর্মের বাধা না হয়। এতদপেক্ষা বর্তমান ভারতে দুরাশা আর নাই, ইহাই ভারতজীবনের উচ্চতম সোপান।

৪৩.৬ প্রাসঙ্গিক আলোচনা ও বিশ্লেষণ

এই নিবন্ধটি বিবেকানন্দের প্রতিভার এক বিশিষ্ট নিদর্শন। শূদ্র জাগরণের বিষয়টিকে তিনি সমকালের বিশ্বের যুগস্বভাবের দিক থেকে ইতিহাসের তথ্যমালার উপস্থাপনের প্রেক্ষাপটে, এবং সমাজতাত্ত্বিক বিবর্তনের পটভূমিকায় পর্যবেক্ষণ করেছেন ; আলোচনার মূল দৃষ্টিচকোণটি হল—তুলনামূলকতার দিক। সবার শেষে আছে—সাহিত্যিক দিক থেকে বিষয়টির প্রকাশগত দিক। এই সবগুলি মিলিত ও একত্র হয়ে রচনাটিকে করে তুলেছে একান্তভাবেই বিবেকানন্দীয়।

প্রবন্ধের প্রাথমিক পর্বেই দেখা যায়, লেখক প্রাচীন ভারতীয় বর্ণব্যবস্থার সঙ্গে আধুনিক ভারতের ইংরেজ প্রশাসনের (Administration) তুলনামূলক আলোচনা করেছেন। তুলনাটি সমাজব্যবস্থার সঙ্গে শাসনব্যবস্থার। দুই ভিন্ন বিষয়ের মধ্যে তুলনা। ভিন্ন বিষয়ের মধ্যে তুলনা বলেই তা প্রতিভার পরিচায়ক। লেখক বলেন ঃ ইংরেজ আজ ব্রাহ্মণ, ইংরেজই আজ ক্ষত্রিয় এবং পুনশ্চ ইংরেজই আজ বৈশ্য। একা ইংরেজ প্রশাসনই প্রাচীন ভারতীয় বর্ণব্যবস্থাকে নিজের মধ্যে সংহরণ করে নিয়েছে। আর সেই ইংরেজের দ্বারা শাসিত গোটা ভারতীয়গণই আজ শূদ্রে পরিণত। এইভাবে 'শূদ্র' এই আখ্যাটিকে একটি অভিনব রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক পটভূমিকায় দেখা হয়েছে। লেখকের আক্ষেপ, এই রাজনৈতিক 'শূদ্রত্ব' ঘোচাবার জন্য ভারতবাসীদের মধ্যে কোনো প্রয়াস নেই, উদ্যম নেই। তাদের ভবিষ্যৎ অন্ধকারে আচ্ছন্ন। অপরদিকে ভারতবাসীদের নিজেদের মধ্যেই আছে ঈর্ষা ও অনৈক্য, পরস্পরের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা। যেমন জাতিগত দিক থেকে শূদ্রদের নিজেদের মধ্যে ঈর্ষা-অনৈক্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা আছে, রাজনৈতিক শূদ্র অর্থাৎ পরাধীন ভারতবাসীদের মধ্যেও তাই দেখা যায়। একদিকে ব্রাহ্ম-ক্ষত্রিয়-বৈশ্যগণ পরস্পরের মধ্যে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত, অপরদিকে শূদ্রগণের মধ্যেও তাই। এই স্বাভাবিক কারণেই শূদ্রগণ আজ একটি পতিত জাতিতে পরিণত হয়েছে।

অতঃপর লেখক রচনাবলির বিশ্বের রাজনৈতিক ঘটনাবলি পর্যবেক্ষণে রত হয়েছেন এবং সমগ্র সমকালীন বিশ্বের একটি লক্ষণকে খুঁজে পেয়েছেন, যার নাম তিনি দিয়েছেন 'যুগস্বভাব'। এই 'যুগস্বভাব'কে তিনি অবহেলিত উপেক্ষিত বিধ্বস্ত শূদ্রগণের পক্ষে আশাব্যঞ্জক বলে মনে করেন। পৃথিবীর ইতিহাসে তখন দেখা যাচ্ছিল যুগ প্রভাবে বা কাল প্রভাবে সমাজের উচ্চবর্ণ ক্রমেই শূদ্রত্ব প্রাপ্ত অর্থাৎ নিম্নবর্ণে পরিণত হচ্ছে, বর্ণভেদ ঘুচে যাচ্ছে, শূদ্রদের পক্ষে তা শুভ ঘটনা। লেখকের মন্তব্য ঃ "কালপ্রভাবে ব্রাহ্মণাদি বর্ণও শূদ্রের নিম্নাসনে সমানীত হইতেছে এবং শূদ্র জাতিও উচ্চস্থানে উত্তোলিত হইতেছে।" সমকালীন ইতিহাস থেকে তিনি তার দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। যেমন, রোমরাজ্যের পতনের পর ইউরোপের নানা পরাধীন দেশের উত্থান ঘটেছে ; মহাবল চীনের পতন ঘটছে, নগণ্য জাপান রাজনৈতিক উচ্চবর্ণ প্রাপ্ত হচ্ছে। গ্রীস-ইতালি-তুরস্ক-স্পেনের নিম্নাভিমুখ পতনও এখানে উল্লেখযোগ্য। সর্বত্রই উচ্চশক্তির পতন পরাভব এবং নিম্নশক্তির উত্থান সূচিত হচ্ছিল। বিশ্বের এবং ভারতের শূদ্রগণের পক্ষে এইসব ঘটনা বিশেষ উদ্দীপনার সূচক, সন্দেহ নেই। বিশ্বের এবং ভারতের শূদ্রগণের পক্ষে এইসব ঘটনা বিশেষ উদ্দীপনার সূচক, সন্দেহ নেই। পাশ্চাত্য জগতে এই যে উচ্চশক্তির ক্রমাবনতি, তার পেছনে কারণ হিসেবে আছে সোস্যালিজম (সমাজতন্ত্রবাদ), এনর্কিজম্, (নৈরাজ্যবাদ) এবং জাইহিলিজম্ (জাতিবাদ)। ইউরোপের এইসব রাজনৈতিক মতবাদগুলিকেই লেখক "বিপ্লবের অগ্রগামী ধ্বজা" বলে মনে করেন। এই সব বিপ্লবের ফলেই উচ্চশক্তির পরাভব ঘটে চলেছে। এরই ফলে, অর্থাৎ ইতিহাসের এক অমোঘ নির্দেশের ফলে ও বলে ভারত ও বিশ্বের শূদ্রগণের উন্নতি আসন্ন।

কিন্তু শূদ্রগণের এই বিশ্বব্যাপী আসন্ন উন্নতি প্রসঙ্গে লেখকের দুটি বিশেষ বক্তব্যও এখানে উল্লেখযোগ্য।

প্রথমত, শূদ্রের যে জাগরণ ও উন্নয়ন ঘটবে, তাতে শূদ্রগণ তাদের নিজস্ব ধর্ম-কর্ম-সংস্কার-সংস্কৃতিকে হারিয়ে ফেলবে না,—"শূদ্র 'ধর্ম-কর্মসহিত সর্বদেশের শূদ্রেরা সমাজে একাধিপত্য লাভ করিবে।" দ্বিতীয়ত, সেইটি আয়ত্ত করতে গেলে শূদ্রদের নিজেদেরও পরিবর্তন ঘটাতে হবে, তার জন্য জাতিগত প্রস্তুতি নিতে হবে। কারণ "যুগ-যুগান্তরের পেষণের ফলে শূদ্রমাত্রেই হয় কুক্কুরবৎ পদলেহক, নতুবা হিংস্র পশুবৎ নৃশংস। আবার চিরকালই তাহাদের বাসনা নিস্ফল ; এবং দৃঢ়তা ও অধ্যবসায় তাহাদের একেবারেই নাই।" অর্থাৎ কেবল যুগস্বভাব বা কালপ্রবাহের কারণেই নিতান্ত অনায়াসে ও অবলীলাক্রমেই শূদ্র-জাগরণ ঘটবে না ; তাদের পক্ষ থেকেও তাদের জাতীয় কর্মসম্পাদন করতে হবে,—তবেই জাগরণ ও উন্নতি সম্ভব হবে।

লেখক এরপর প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সমাজকাঠামোর দৃঢ়তা ও স্থায়ী দিকে তুলনামূলক আলোচনা করেছেন এবং সমাজে শূদ্রগণের অবস্থানের নিশ্চয়তা সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন। প্রথমেই লক্ষণীয়, পাশ্চাত্য জাতি 'গুণগতজাতি'। এর অর্থ হল, ব্যক্তির নিজস্ব quality বা গুণ অনুসারে সমাজে সে উচ্চ বা নীচ স্থানে অবস্থান করে। পাশ্চাত্যের শিক্ষাবিস্তার সত্ত্বেও এই গুণগত জাতির দকি একটি দোষের বা অনিষ্টের কারণ। কিন্তু প্রাচীন ভারতে এই 'গুণগতজাতি' তত্ত্ব "শূদ্রগণকে দৃঢ় বন্ধনে বন্ধ করিয়া রাখিয়াছিল"। 'গুণগতজাতি' তত্ত্ব পাশ্চাত্যের পক্ষে অনিষ্টের আর ভারতের পক্ষে ইষ্টের কারণ কেন ? আপন প্রতিভাবলে কোন শূদ্র ধনশালী বা বলবান হলে, তাকে সমাজের উপরিতলে স্থান দেওয়া হত, এতে তার জাতি আপন বিশুদ্ধতা নিয়ে আপনার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকত। তবে এ প্রথার বড়ো দোশ উন্নত ও প্রতিভাশীল শূদ্রের বিদ্যা-বুদ্ধি-ধনের ভাগ তার নিজের জাতি পেতে পারে না। তেমনি আবার ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়-বৈশ্যকুল থেকে পতিতেরা স্বাভাবিক কারণেই শূদ্রকুলে গৃহীত হত। এই শূদ্রের সংখ্যাও বেড়ে যেত।

কিন্তু আধুনিক ভারতে, ইংরেজের শাসনের ফলে কোন শূদ্র পণ্ডিত বা ধনবান হলেও, তার নিজের সমাজ ত্যাগের অধিকার নেই। "কাজেই তাহাদের বিদ্যাবুদ্ধির ও ধনের প্রভাব স্বজাতিগত হইয়া স্বীয় মণ্ডলীর উন্নতিকল্পে প্রযুক্ত হইতেছে।" এর ফলে আপন বৃত্তমধ্যগত শূদ্রগণের ধীরে ধীরে উন্নতি হচ্ছে। ভারতে যতদিন ইংরেজ শাসনব্যবস্থার এই বিধি প্রচলিত থাকবে, ততদিন নীচ জাতিদের এইভাবে উন্নতি হতে থাকবে। সমাজতত্ত্বের সঙ্গে এইভাবে লেখক অর্থনৈতিক দিকটি জড়িত করে নিয়েছেন।

এইবার সমাজের নেতৃত্ব-শক্তির সঙ্গে সমাজের সাধারণ প্রজাগণের সম্পর্কের ফলাফল ব্যক্ত করেছেন লেখক। প্রজাগণই সমাজের মূল শক্তি। কাজেরই এই শক্তির সঙ্গে নেতৃত্বশক্তির যদি বিচ্ছেদ ঘটে তবে, তা ওই নেতৃত্বশক্তিরই পতনের কারণ হয়। ইতিহাসেও তাই দেখা গেছে পৌরোহিত্য শক্তি রাজশক্তির কাছে, রাজশক্তি বৈশ্য শক্তির কাছে পরাভূত হয়েছে। অতঃপর এই বৈশ্য শক্তি শূদ্রশক্তির কাছে পরাভূত হবে। প্রতিক্ষেত্রেই পরাভবের কারণ কর্তৃসম্প্রদায় ক্ষমতাগর্বে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে নিয়েছিল।

কিন্তু এখানেও শূদ্রগণের প্রতি বিবেকানন্দের সাবধানী বাণী উচ্চারিত হয়েছে। শূদ্রশক্তির আধিপত্যের দিন সমাগত। তবে সে জন্য চাই শূদ্রদের নিজেদের মধ্যে ঐক্য, প্রীতি ও সহানুভূতি। ইতিহাসেও দেখা যায়, স্বজাতি বাৎসল্য এবং শত্রুবিদ্বেষই কোনো জাতির উন্নতির মূল কারণ। স্বার্থই জীবনের শিক্ষক। ব্যক্তি ও ব্যষ্টির স্বার্থ রক্ষাই দেশ-জাতি-সমষ্টির উন্নতির কারণ হয়ে ওঠে। অবশ্য ব্যক্তিগত ও ব্যষ্টিগত স্বার্থের মধ্যে গণ্ডীবদ্ধ হওয়াটাই যেন শেষে বড়ো না হয়ে ওঠে। বর্তমান ভারতে সাধারণ ভারতবাসী কোন প্রকারে উদরপূর্তিতেই সন্তুষ্ট ; উচ্চবর্ণের ভারতবাসী কোনপ্রকারে ধর্মরক্ষাকেই জীবনের বড়ো আশা বলে মনে করে। লেখকের মতে, এখানেই আত্মস্বার্থ রক্ষা কোনো বৃহৎ জাতীয় স্বার্থরক্ষার সোপান না হয়ে সমাপ্তি হয়ে থাকে, যা বিশেষ শোচনার কারণ। আত্মস্বার্থ ও ব্যক্তি স্বার্থ রক্ষাই হবে বৃহত্তর স্বার্থরক্ষার প্রাথমিক স্তর।

লেখকের এই বক্তব্য এক বিশেষ গদ্যশৈলীতে ব্যক্ত হয়েছে। মানুষকে, দেশবাসীকে আবেগচালিত করবার জন্য

তিনি প্রথমাংশে নিয়েছেন পুনরাবৃত্তির আশ্রয়, একটু বা ব্যঙ্গাত্মক তির্যক দৃষ্টির অনুসরণ। নতুবা এই রচনাটিতে ইতিহাসবোধ ও যুক্তি নিষ্ঠা যেভাবে প্রতিফলিত হয়েছে তা বিশেষ প্রশংসার কারণ। শব্দচয়নের মধ্যে যে দৃঢ়তা আছে, তা প্রবন্ধটিরই অন্তর্নিহিত দৃঢ়তার সূচক।

তবে, বক্তব্য বিন্যাসের ক্ষেত্রে একটি অসম্পূর্ণতা ঈষৎ পীড়াদায়ক ঃ 'গুণগত জাতি' সম্পর্কে লেখকের বক্তব্য আর একটু প্রসারিত হবার অপেক্ষা রাখে। 'গুণগত জাতি' পাশ্চাত্য দেশের শূদ্রজাতির অভ্যুত্থানের পক্ষে কিভাবে দোষ বা অনিষ্টের কারণ হয়ে উঠেছে, সাধারণ পাঠক তা সহজে ধারণা করে উঠতে পারে না। তেমনি, বিপরীত দিকে, সেই তত্ত্বটি প্রাচীন ভারতের শূদ্রকুলকে কিভাবে "দৃঢ়বন্ধনে বন্ধ করিয়া রাখিয়াছিল" তাও স্পষ্টতর হওয়ার প্রয়োজন ছিল।

৪৩.৭ সারাংশ - ১

প্রাচীন ভারতের সামাজিক কাঠামোটি ছিল এইরকম ঃ সবার উপরে ব্রাহ্মণ, তার নীচে ক্ষত্রিয়, তারপর বৈশ্য এবং সবার নীচে শূদ্রগণ। স্বভাবতই এই শূদ্রগণ ছিল সমাজে অবহেলিত ও অনুন্নত। উচ্চবর্ণের মানুষের দ্বারা শোষিত। লেখক এই অর্থে 'শূদ্র' বর্ণকে যেমন গ্রহণ করেছেন, তেমনি আর একটি অর্থাৎ এটিকে প্রয়োগ করেছেন ঃ ইংরেজের রাজত্বে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-মারাই, যে কোন ভারতীয় শূদ্রে পরিণত। অর্থাৎ সব ভারতবাসীই তৎকালীন ইংরেজ রাজশক্তির দ্বারা দলিত, পরাভূত। সব ভারতীয়ই তখন তাই শূদ্রের সমান। এইভাবে লেখক 'শূদ্র' আখ্যাটিকে একটি প্রসারিত অর্থে প্রয়োগ করেছেন। কেবল সব ভারতীয়ই নয়,—পৃথিবীর যেখানে যত দলিত উপেক্ষিত-অনুন্নত সমাজ ও গোষ্ঠী আছে, তারও যেন শূদ্র। এইভাবে ক্রমে-ক্রমে শূদ্র আখ্যাটিকে প্রবন্ধকার প্রসারিত ও বিস্তৃত করে নিয়েছেন। এই শূদ্রের জাগরণ ও উত্থান প্রসঙ্গটি আলোচ্য প্রবন্ধের বিবেচ্য। এই উত্থান ও জাগরণের আছে দুটি দিক ঃ একদিকে শূদ্রদের নিজের মধ্যে চাই ঐক্য-সংহতি-প্রীতির প্রতিষ্ঠা ; অন্যদিকে তাদের সঙ্গে শাসনগমের সহযোগিতা। লেখকের বিশ্বাস, পাশ্চাত্য দেশে তৎকালে যে নানা রাজনৈতিক মতবাদের প্রতিষ্ঠা ও প্রচার দেখা গেছে, তা শূদ্র জাগরণেই পূর্বাভাস ও তার পরিপোষক। অবশ্য উচ্চবর্ণের মানুষেরা সেজন্য ভীত ও উদ্বিগ্ন। শূদ্রের এই জাগরণ হবে—শূদ্রদেরই নিজস্ব ধর্ম-কর্ম—সংস্কৃতিকে অঙ্গীকার করে নিয়ে তাদেরই জীবনবৃত্তের মধ্যে এবং সর্বদেশের শূদ্রের সমাজে।

সমাজের প্রচলিত কাঠামোটিকেও এজন্য দৃঢ় করা প্রয়োজন। দেখা যায়, কোনো মানুষের গুণ বা দোষ অনুসারে সে সেই সমাজের উঁচু স্তরে ওঠে বা নীচে স্তরে নেমে যায়। এতে সমাজের বাঁধুনির দৃঢ়তা থাকে না। আবার, গুণ বা প্রতিভাবলে কোন নীচু বর্ণের মানুষ যদি সমাজের উচ্চস্তরে উঠে যায়, তবে তার নিজস্ব সমাজ তার গুণ বা প্রতিভার সুফল পায় না। তেমনি কোন ব্যক্তিগত দোষের ফলে সমাজের উঁচু তলার মানুষ নীচে নেমে এসে নীচু সমাদেল আবর্জনা বাড়ায়। সমাজে ব্যক্তি মানুষের এই ওঠা-নামাটি বন্ধ করতে হবে। তবেই শূদ্রজাতির উত্থান ও উন্নতি ত্বরান্বিত হবে। আধুনিক ভারতে কোন শূদ্র মহাপণ্ডিত হলে কিংবা বিশেষ ধনবান হলেও আপন বর্ণ ও সমাজ পরিত্যাগ করতে পারে না। এটিকে শূদ্র-জাগরণের একটি সহায়ক কারণ বলা যায়। এতে শূদ্রের ধন এবং প্রতিভা তাদের নিজ সমাজেরই কাজে লাগবে। এইভাবে ক্রমে ক্রমে নীচ জাতির উন্নতি হতে থাকবে।

মানুষের সমাজ সর্বদাই বিবর্তনশীল। তাই প্রাচীন পৌরোহিত্য শক্তি একদিন রাজশক্তির নিকট পরাভূত হয়েছে ; রাজশক্তি আবার পরাভূত হয়েছে বৈশ্য শক্তির কাছে। এইবার বৈশ্য শক্তি ও শূদ্রশক্তির কাছে পরাভূত হবে বলে আশা করা যায়। ইতিহাসই এ কথা বলে। সর্বক্ষেত্রেই দেখা যায়, উপরের বর্ণ বা শক্তি নীচের বর্ণ বা শক্তি থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করবার ফলে পরাজয় বরণ করতে বাধ্য হয়েছে। বৈশ্য শক্তিও তেমনি শূদ্রশক্তি থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে রেখে নিজেদের পরাজয়ের পথ প্রশস্ত করে চলেছে। ফলে শূদ্রের আধিপত্যের দিন সমাগত। এই অবস্থায় শূদ্রদের আশু কর্তব্য হল, নিজেরা একত্র ও সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে 'জাতি' বা 'দেশ' গঠন করুক। কেননা, ইতিহাসে

দেখা গেছে, স্বজাতির প্রতি প্রীতি এবং শত্রুর প্রতি বিদ্বেষেই এক-এক দেশ বা জাতির উন্নতি হয়েছে।

৪৩.৮ অনুশীলনী - ১

১। নীচের প্রশ্নগুলির সংক্ষিপ্ত উত্তর দিন ঃ

(ক) স্বামী বিবেকানন্দকে কেন 'কর্মবীর' বলা হয় ?
(খ) কোন্ কোন্ দৃষ্টির সমন্বয়ে তাঁর প্রবন্ধসাহিত্য রচিত ?
(গ) 'শূদ্র' বলতে তিনি কাদের বুঝিয়েছেন ?
(ঘ) শূদ্র-জাগরণের প্রাক্কালে শূদ্রদের কর্তব্য প্রসঙ্গে স্বামীজির নির্দেশ ব্যক্ত করুন।
(ঙ) তাঁর সংগীতপ্রিয়তা সম্পর্কে মন্তব্য করুন।
(চ) বিশ্ব ধর্মমহাসভা ক'দিন চলেছিল ?
(ছ) কে তাঁকে 'শক্তিধর পুরুষ' বলেছিলেন ?
(জ) বিবেকানন্দের রচনাবলী কোন্ কোন্ সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হয় ?
(ঝ) তাঁর কয়েকটি প্রবন্ধ গ্রন্থের নাম উল্লেখ করুন।
(ঞ) কথ্য বাংলা সম্পর্কে বিবেকানন্দের বক্তব্য বলুন।

২। নীচের প্রশ্নগুলির বিশদ উত্তর দিন ঃ

(ক) বিবেকানন্দ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মূল্যায়নটি তুলে ধরুন।
(খ) বিবেকানন্দের প্রবন্ধসাহিত্য সম্পর্কে দু-কথা বলুন।
(গ) বিবেকানন্দের শিক্ষা-চিন্তার বিশেষত্ব কী ?
(ঘ) তাঁর মতে খাঁটি সংস্কারক কে ?
(ঙ) 'শূদ্র জাগরণ' প্রবন্ধটির গদ্য শৈলী সম্পর্কে মন্তব্য করুন।
(চ) 'বিপ্লবের অগ্রগামী ধ্বজা' বলতে লেখক কী বুঝিয়েছেন ?

৪৩.৯ মূলপাঠ - ২

ভারতবর্ষের বর্তমান শাসনপ্রণালীতে কতকগুলি দোষ বিদ্যমান, কতকগুলি প্রবণ গুণও আছে। সর্বাপেক্ষা কল্যাণ এই যে, পাটলিপুত্র-সাম্রাজ্যের অধঃপতন হইতে বর্তমান কাল পর্যন্ত, এ প্রকার শক্তিমান ও সর্বব্যাপী অস্মদ্দেশে পরিচালিত হয় নাই। বৈশ্যাধিকারের যে চেষ্টায় এক প্রান্তের পণ্যদ্রব্য অন্য প্রান্তে উপনীত হইতেছে, সেই চেষ্টারই ফলে দেশ-দেশান্তরের ভাবরাশি বলপূর্বক ভারতের অস্থিমজ্জায় প্রবেশ করিতেছে। এই সকল ভাবের মধ্যে কতকগুলি অতি কল্যাণকর, কতকগুলি অমঙ্গলস্বরূপ, আর কতকগুলি পরদেশবাসীর—এ দেশের যথার্থ কল্যাণনির্ধারণে অজ্ঞতার পরিচায়ক।

কিন্তু গুণদোষরাশি ভেদ করিয়া সকল ভবিষ্যৎ মঙ্গালের প্রবল লিঙ্গা[১] দেখা যাইতেছে যে, এই বিজাতীয় ও প্রাচীন স্বজাতীয় ভাবসংঘর্ষে অল্পে অল্পে দীর্ঘসুপ্ত জাতি বিনিদ্র হইতেছে। ভুল করুন, ক্ষতি নাই ; সকল কার্যেই ভ্রমপ্রমাদ আমাদের একমাত্র শিক্ষক। যে ভ্রমে পতিত হয়, ঋতপথ তাহারই প্রাপ্য। বৃক্ষ ভুল করে না, প্রস্তরখণ্ডও ভ্রমে পতিত হয় না, পশুকুলে নিয়মের বিপরীতাচারণ অত্যল্পই দৃষ্ট হয় ; কিন্তু ভূদেবের উৎপত্তি ভ্রম-প্রমাদপূর্ণ। দন্তধাবন হইতে মৃত্যু পর্যন্ত সমস্ত কর্ম, নিদ্রাভঙ্গ হইতে শয্যাশ্রয় পর্যন্ত সমস্ত চিন্তা যদি অপরে আমাদের জন্য পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে নির্ধারিত করিয়া দেয় এবং রাজশক্তির পেষণে ঐ সকল নিয়মের বজ্রবন্ধনে আমাদের বেষ্টিত করে,

১. চিহ্ন

তাহা হইলে আমাদের আর চিন্তা করিবার কি থাকে ? মননশীল বলিয়াই না আমরা মনুষ্য, মনীষী, মূনি ? চিন্তাশীলতার লোপের সঙ্গে সঙ্গে তমোগুণের প্রাদুর্ভাব, জড়ত্বের আগমন। এখনও প্রত্যেক ধর্মনেতা, সমাজনেতা সমাজের জন্য নিয়ম করিবার জন্য ব্যস্ত ! ! ! দেশে কি নিয়মের অভাব ? নিয়মের পেষণে যে সর্বনাশ উপস্থিত, কে বুঝে ?

সম্পূর্ণ স্বাধীন স্বেচ্ছাচারী রাজার অধীনে বিজিত জাতি বিশেষ ঘৃণার পাত্র হয় না। অপ্রতিহতশক্তি সম্রাটের প্রজারই সমান অধিকার, অর্থাৎ কোন প্রজারই রাজশক্তির নিয়মে কিছুমাত্র অধিকার নাই। সে স্থলে জাত্যভিমানজনিত বিশেষাধিকার অল্পই থাকে। কিন্তু যেখানে প্রজানিয়মিত রাজ বা প্রজাতন্ত্র বিজিত জাতির শাসন করে, সে স্থানে বিজয়ী ও বিজিতের মধ্যে অতি বিস্তীর্ণ ব্যবধান নির্মিত হয়, এবং যে শক্তি বিজিতদিগের কল্যাণে সম্পূর্ণ নিযুক্ত হইলে অত্যল্পকালে বিজিত জাতির বহুকল্যাণসাধনে সমর্থ, সে শক্তির অধিকাংশ ভাগই বিজিত জাতিকে স্ববশে রাখিবার চেষ্টায় ও আয়োজনে প্রযুক্ত হইয়া বৃথা ব্যয়িত হয়। প্রজাতন্ত্র রোমাপেক্ষা সম্রাড়ধিষ্ঠিত রোমাক-শাসনে বিজাতীয় প্রজাদের সুখ অধিক এজন্যই হইয়াছিল। এজন্যই বিজিত ইহুদীবংশোদ্ভূত হইয়াও খ্রিস্টধর্মপ্রচারক পোল (St. Paul), কেশরী (Caesar) সম্রাটের[১] সমক্ষে আপনার অপরাধ বিচারের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ব্যক্তিবিশেষ ইংরেজ কৃষ্ণবর্ণ বা 'নেটিভ' অর্থাৎ অসভ্য বলিয়া আমাদিগকে অবজ্ঞা করিল ইহাতে ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। আমাদের আপনার মধ্যে তদপেক্ষা অনেক অধিক জাতিগত ঘৃণাবুদ্ধি আছে ; এবং মূর্খ ক্ষত্রিয় রাজা সহায় হইলে ব্রাহ্মণেরা যে শূদ্রদের জিহ্বাচ্ছেদ, শরীরভেদাদি' পুনরায় করিবার চেষ্টা করিবেন না, কে বলিতে পারে ? প্রাচ্য আর্যাবর্তে সকল জাতির মধ্যে যে সামাজিক উন্নতিকল্পে কিঞ্চিৎ সদ্ভাব দৃষ্ট হইতেছে, মহারাষ্ট্র দেশে ব্রাহ্মণেরা 'মারাঠা' জাতির যে সকল স্তবস্তুতি আরম্ভ করিয়াছেন, নিম্ন জাতিদের এখনও তাহা নিঃস্বার্থভাব হইতে সমর্থিত বলিয়া ধারণা হইতেছে না। কিন্তু ইংরেজ সাধারণের মনে ক্রমশঃ এক ধারণা উপস্থিত হইতেছে যে, ভারতসাম্রাজ্যে তাঁহাদের অধিকারচ্যুত হইলে ইংরেজজাতির সর্বনাশ উপস্থিত হইবে। অতএব 'যেন তেন প্রকারেণ' ভারতে ইংলন্ডাধিকার প্রবল রাখিতে হইবে। এই অধিকার রক্ষার প্রধান উপায় ভারতবাসীর বক্ষে ইংরেজজাতির 'গৌরব' সদা জাগরূপ রাখা। এই বুদ্ধির প্রাবল্য ও তাহার সহযোগী চেষ্টার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি দেখিয়া যুগপৎ হাস্য ও করুণরসের উদয়। ভারতনিবাসী ইংরেজ বুঝি ভুলিয়া যাইতেছেন যে, যে বীর্য অধ্যবসায় ও স্বজাতির একান্ত সহানুভূতিবলে তাঁহারা এই রাজ্য অর্জন করিয়াছেন যে সদাজাগরূপ বিজ্ঞান-সহায় বাণিজ্য বুদ্ধিবলে সর্বধনপ্রসূ ভারতভূমিও ইংলন্ডের প্রধান পণ্যবীথিকা হইয়া পড়িয়াছে, যতদিন জাতীয় জীবন হইতে এই সকল গুণ লোপ না হয়, ততদিন তাঁহাদের সিংহাসন অচল। এই সকল গুণ যতদিন ইংরেজের থাকিবে এমন ভারতরাজ্য—শত শত লুপ্ত হইলেও শত শত আবার অর্জিত হইবে। কিন্তু যদি ঐ সকল গুণ প্রবাহের বেগ মন্দীকৃত হয় ; বৃথা গৌরবঘোষণে কি সাম্রাজ্য শাসিত হইবে ? এজন্য যে সকল গুণের প্রাবল্য সত্ত্বেও অর্থহীন 'গৌরব' রক্ষার জন্য এত শক্তিক্ষয় নিরর্থক। উহা প্রজার কল্যাণে নিয়োজিত হইলে শাসক ও শাসিত উভয় জাতিরই নিশ্চিত মঙ্গালপ্রদ।

৪৩.১০ প্রাসঙ্গিক আলোচনা ও বিশ্লেষণ

'শূদ্রজাগরণ' প্রবন্ধটির প্রথমাংশ যেমন লেখকের প্রতিভার দ্যুতিতে সমুজ্জ্বল, দ্বিতীয়াংশ তদ্রূপ নয়। আসলে প্রথম অংশেই ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব এবং বিশ্লেষণী প্রতিভার যে প্রয়োজন ছিল, দ্বিতীয়াংশে সে প্রয়োজন যেন অনেকটাই স্তিমিত হয়ে এসেছে। প্রথমাংশে শূদ্রজাগরণের প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের পর দ্বিতীয়াংশে শূদ্রজাগরণের ক্ষেত্রে ইংরেজের ভূমিকাটিই লেখকের দৃষ্টিকে কেড়ে নিয়েছে। আবার, এই ইংরেজের ভূমিকাটি বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ যে যে পথে চারণা করেছেন, সমস্যার পটভূমিকাটি অভিন্ন বলে, বিবেকানন্দও মোটামুটি সেই পথে গিয়েছেন। সকলেই ইংরেজের মধ্যে দুই বিপরীত সত্তাকে দেখেছেন ঃ একটি

১. রোমক সম্রাট সীজার

ভালোর দিক, ভারতবাসী যার ফলে নানাভাবে উন্নত হবার সুযোগ পেয়েছে। অপরটি ইংরেজের দোষ-দুর্বলতার দিক। শূদ্র-ব্রাহ্মণের প্রসঙ্গ বঙ্কিমচন্দ্র তুলেছেন, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সে অর্থে তোলেননি। বঙ্কিমচন্দ্র প্রাচীন ভারতে ব্রাহ্মণের যে রাজনৈতিক সামাজিক সুযোগ সুবিধের কথা তুলেছেন, আধুনিক ভারতে ব্রাহ্মণের রাজনৈতিক-সামাজিক সুযোগ সুবিধার তুলনামূলক আলোচনা করেছেন। নতুবা বঙ্কিমচন্দ্রের মতে, প্রাচীন ভারতীয় শূদ্র আর আধুনিক ভারতের শূদ্রগণের মধ্যে কোনো তফাত নেই। প্রাচীন ভারতীয় সমাজে ব্রাহ্মণই ছল ইংরেজবৎ। কাজেই তখন শূদ্রগণ অত্যাচারিত হত ব্রাহ্মণের দ্বারা, আধুনিক ভারতে ইংরেজের দ্বারা। কিন্তু শূদ্রের উন্নতির বা জাগরণের কোনো পথ বঙ্কিমচন্দ্র নির্দেশ করেননি। আলোচ্য প্রবন্ধে বিবেকানন্দ যা করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথ বিবেকানন্দ তিনজনেই ইংরেজের সহযোগিতার প্রশ্নটি তুলেছেন। রবীন্দ্রনাথের মতে ইংরেজের সাম্রাজ্যবাদী মনোভাব, বিবেকানন্দের মতে, ইংরেজের 'গৌরব রক্ষা', প্রভৃতি কারণে ইংরেজ ভারতবাসীর জন্য কল্যাণকর্ম করতে রাজি নয়। শূদ্রের প্রতি উচ্চবর্ণের মানুষের নিপীড়ণমূলক আচরণকে রবীন্দ্রনাথ কবি-সুলভ মানবিক দৃষ্টি নিয়ে দেখেছেন, যাকে নীচেও পশ্চাতে রাখা হয়, সেই উচ্চবর্ণকে 'পশ্চাতে টানিছে'। বিবেকানন্দ সেখানে ইতিহাসের নজির উত্থাপন করে বলেন, সমগ্র বিশ্বেই আজ উচ্চবর্ণের ও শক্তিধর রাষ্ট্রের পতনের পালা এবং শূদ্রের উত্থানের যুগ চলছে। স্বাভাবিক কারণেই বিবেকানন্দ ইতিহাস ও সমাজতত্ত্বের দিকটিকে আশ্রয় করেছেন। অবশ্য, 'কালান্তর' এবং 'সভ্যতার সংকট' প্রবন্ধ দুটিতে রবীন্দ্রনাথও ইতিহাসের তথ্যের উল্লেখ করেছেন।

বিবেকানন্দের 'শূদ্রজাগরণে'র প্রসঙ্গে কেউ কেউ রবীন্দ্রনাথের 'রথের রশি' এবং তারই অন্তর্গত 'কবির দীক্ষা' রচনা দুটির উল্লেখ করে থাকেন। বিবেকান্দ দেখিয়েছেন, বিচ্ছিন্ন করে রাখবার ফলে পৌরোহিত্য শক্তি রাজশক্তির কাছে এবং রাজশক্তি বৈশ্য শক্তির কাছে পরাভূত হয়ে আসছে এবং এই সূত্রানুয়ারী এই বার শূদ্রের আধিপত্যের দিন সমাগত। রবীন্দ্রনাথের 'রথের রশি' এবং 'কবির দীক্ষা' বিবেকানন্দের পরবর্তীকালে রচিত, স্বভাবতই রবীন্দ্রনাথ আরো পরবর্তীকালীন চিন্তার অবকাশ পেয়েছেন। রথের চাকা আর্য শক্তির টানে না চলে অনার্য শক্তির টানে যেখানে চলতে শুরু করেছে সেখানে শূদ্র বা অনার্য শক্তির উল্লাসিত হবার কারণ নেই। কারণ, বিজয়লাভের পর তারাও যতি নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে রাখে, তবে তাদেরও পতন অনিবার্য। 'কবির দীক্ষা'র সন্ন্যাসী কি বিবেকানন্দ ? বিবেকানন্দ হোন বা না হোন রবীন্দ্রনাথের রাজাগণ 'রাজর্ষি', একাধারে রাজা ও ঋষি। এই ঋষিবৎ নিরাসক্ত চরিত্রগুলি রবীন্দ্রনাথকে প্রথমাবধি আকৃষ্ট করেছে। রবীন্দ্রকল্পনায় 'রথের রশি'র 'রশি' শেষে মানববন্ধনে পরিণত হয়েছে—'এখন আর দেরী নয় ধর্ গো তোরা হাতে হাতে ধর্গো।' উচ্চ নীচ সকলের হাতে হাতে বন্ধন তৈরি করে কালের রথ চালনা করা। আর যদি তা না করা হয় তবে শূদ্রদেরও একদিন পরাভব স্বীকার করতে হবে।

৪৩.১১ সারাংশ - ২

প্রবন্ধের প্রথম অংশে শূদ্রদের অবনতিরও অনুন্নতির কারণ নির্দেশ করেছেন লেখক। সেই সঙ্গে নির্দেশ করেছেন শূদ্রগণের জাতীয় কর্তব্য। আর, প্রবন্ধের এই দ্বিতীয় অংশে আছে, ভারতের তদানীন্তন শাসকগোষ্ঠীর কর্তব্য কথা। ভারতের তৎকালীন শাসক বলতে ব্রিটিশ রাজশক্তি প্রাচীন ভারতের মৌর্যযুগের পর ব্রিটিশ শাসন-ব্যবস্থার মতো এত সুদৃঢ় শাসনব্যবস্থা আধুনিক ভারতে আর দেখা যায়নি। তবে, ব্রটিশ শাসনব্যবস্থার দোষ এবং গুণ—দুইই আছে। গুণের দিকটি এই ঃ ব্রিটিশ জাতি যেন বৈশ্যজাতি, বৈশ্যের মতোই বেণে। তবে ব্রিটিশ-বানিয়া দেশ-বিদেশ থেকে কেবল ভোগ্যপণ্যই ভারতে নিয়ে আসেনি ; সঙ্গে এনেছে দেশ-বিদেশের নানা ভাব-ভানা। শূদ্র-ভারতবাসী দেশ বিদেশের সেইসব ভাব-ভাবনায় ক্রমে ক্রমেই উন্নত হয়ে উঠেছে। কিন্তু ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থায় কিছু দোষের দিকও আছে ; এই শাসনব্যবস্থা এত দৃঢ় ও নিয়মবন্ধ যে তা ভারতবাসীর চিন্তা শক্তিকে হ্রাস করে দিচ্ছে, জাতীয় জীবনে তাকে জড় করে রাখছে।

অতঃপর লেখক রাজতন্ত্র এবং প্রজাতন্ত্র—এই দুই শাসনব্যবস্থার মধ্যে তুলনা করে দেখাচ্ছেন, রাজতান্ত্রিক

শাসনব্যবস্থাই প্রজার পক্ষে মঙ্গলদায়ক হয়,—অন্তত ইতিহাসে সাক্ষ্য তাই। ইতিহাস থেকে লেখক তার দৃষ্টান্ত সংকলন করেছেন। রাজতন্ত্রে স্বেচ্ছাচারী রাজা কোন প্রজাকেই সুবিধা দেন না, কাজেই বিশেষ কোন গোষ্ঠীর সুযোগ পাবার কোন সম্ভাবনাই সেখানে নেই। প্রজাদের মনের মধ্যেও এজন্য কোন অসন্তোষ থাকে না। রাজার কৃপা অর্জনের জন্য প্রজাদের মধ্যেও কোন প্রয়াস ও প্রতিযোগিতা থাকে না। কিন্তু প্রজাতন্ত্রে বা প্রজা নিয়ন্ত্রিত শাসন ব্যবস্থায় শাসক-শাসিতের মধ্যে বহু পার্থক্য এসে পড়ে। প্রজাদের স্ববশে রাখবার জন্য, শাসকগোষ্ঠী তাদের সব শক্তি শাসিতের কল্যাণের জন্য ব্যয় না করে নিজেকে দৃঢ় করবার উদ্দেশ্যে তা নিয়োগ করে। এতে শক্তির অপচয় এবং অপব্যয় ঘটে। ইংরেজের শাসনপ্রণালীর বিশিষ্টতা ও দৃঢ়তা একদিকে শূদ্ররূপী ভাবতবাসীকে জড়ত্বের দিকে ঠেলে দিচ্ছে ; অপরদিকে শাসকরূপে ইংরেজ তার আপন শক্তিকে নিজে গৌরব প্রচারের জন্যে নিযুক্ত করছে।

আজ ভারতবাসীর প্রধান কর্তব্য নিজেদের মধ্যে যে সংশয়-বিতর্ক-বিদ্বেষের ভাব আছে, তাকে সরিয়ে ফেলে একত্র হওয়া। অন্যদিকে ইংরেজও আজ ভুল করছে ঃ যে বীরত্ব, অধ্যবসায় ও বুদ্ধিবলে তারা একদিন ভারতবর্ষ জয় করেছে, তারা মনে করে, তাদের সেই জাতীয় 'গৌরব' রক্ষা করে চললেই বুঝি এদেশে তা চিরস্মরণীয় হবে। তাদের সব শক্তি তাই আজ সেই জাতীয় 'গৌরব' রক্ষার প্রতি নিয়োজিত। তাদের এই শক্তিকে তারা যদি শূদ্র-ভারতের কল্যাণকর্মে নিযুক্ত করত, তবে ভারত ও ব্রিটেন উভয় দেশেরই মঙ্গল হত। ফলে শূদ্র ভারতের জাগরণ ও উন্নতি ত্বরান্বিত হত।

৪৩.১২ অনুশীলনী - ২

১। নীচের প্রশ্নগুলির সংক্ষিপ্ত উত্তর দিন ঃ

(ক) ব্রিটিশ-শাসনব্যবস্থার গুণের দিকটি কী ?

(খ) ইংরেজকে 'বৈশ্য' কেন বলা হয়েছে ?

(গ) কেন ব্রিটিশ-শাসনব্যবস্থায় ভারতবাসী 'জড়' হয়ে পড়ছে ?

(ঘ) কেন ইংরেজগণ ভারতবাসীর মনে ইংরেজ জাতির 'গৌরব'কে সদাই জাগিয়ে রাখতে চায় ?

(ঙ) 'যেন তেন প্রকারেণ'—এই বাগধারাটি আলোচ্য প্রসঙ্গে কোন্ অর্থে প্রযুক্ত হয়েছে ?

২। নীচের প্রশ্নগুলির বিস্তৃত উত্তর দিন ঃ

(ক) রাজতান্ত্রিক এবং প্রজাতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার দোষ গুণ সম্পর্কে আলোচনা করুন। বর্তমান প্রবন্ধে প্রসঙ্গটির অবতারণার কারণ কী ?

(খ) শূদ্রজাগরণের প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য সহজ কথা বিশ্লেষণ করুন।

(গ) 'শূদ্রজাগরণ' প্রবন্ধটির প্রথমাংশের সঙ্গে দ্বিতীয়াংশের তুলনামূলক আলোচনা করুন।

৪৩.১৩ গ্রন্থপঞ্জি

(১) স্বামী বিবেকানন্দ ঃ বর্তমান ভারত।

(২) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ কালান্তর। সভ্যতার সংকট। রথের রশি। কবির দীক্ষা।

(৩) বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঃ বিবিধ প্রবন্ধ।

(৪) অধীর দে ঃ আধুনিক বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের ধারা।